কলা অনুষদ পত্রিকা, খণ্ড : ১৪, সংখ্যা : ১৯, জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৪
DOI:

নৈতিকতার ইসলামি মানদণ্ডের স্বরূপ বিশ্লেষণ

আবুল খায়ের*

Abstract: The voluntary conducts of human beings living in societies are judged by moral standard. Islam, as a complete code of life (al Qura'n, 3 : 19) provides two types of moral standards : primary and secondary. According to Islam, al Qura'n and al Sunnah (Traditions of the great prophet sm.) are the primary sources of morality while Ijma' (Consensus of juristic opinion), Qiyas (Juristic deduction), Istihsan (Juristic equity), Masalihe mursalah (Public good), Sadduj jara'e (obstructing the means), Istihsab (Legal presumption), 'Urf (good customs) etc. are the secondary source of Islamic law and morality. By these standards Islam ensures the wellbeing of humanity as well as saves humanity from all kinds of evils. This article explores the nature of moral standards of Islam using reasoned inquiry and logical analysis. Eventually it shows that the standards of Islam are very authentic and applicable in every situation in respect of space, time and society.

ভূমিকা

সমাজবদ্ধ মানুষের ঐচ্ছিক আচরণের নৈতিক মূল্য তথা ইতি-নেতি, ঔচিত্য-অনৌচিত্য যে আদর্শের (Standard) ভিত্তিতে নির্ণীত হয় তাকে নৈতিক মানদণ্ড বলে। নৈতিক মানদণ্ডের সাহায্যে একদিকে যেমন ঐচ্ছিক ক্রিয়ার নৈতিক মান নির্নয় করা হয়, অন্যদিকে আবার নৈতিক কর্তব্যও নির্দেশ করা হয়। অর্থাৎ কোন কাজটি করা বাঞ্ছনীয়, কোনটি গর্হিত ও বর্জনীয় তাও নৈতিক মানদণ্ড নির্দেশ করে থাকে। সে কারণে দর্শন ও নীতিবিদ্যায় প্রাচীন কাল থেকে নৈতিক মানদণ্ড সম্পর্কিত আলোচনা গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়ে আসছে।

ইসলাম বিশ্বের একটি প্রাণবন্ত ও গতিশীল ধর্ম হিসেবে মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়ার ইতি-নেতি, ঔচিত্য-অনৌচিত্য, মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ণয় করে থাকে। আবার, কী তার করণীয়, কী বর্জনীয়, কী বাঞ্ছিত, কী গর্হিত, কী কল্যাণকর, কী ক্ষতিকর, কী পুরস্কারযোগ্য, কী শাস্তিযোগ্য ইত্যাদিও নির্দেশ করে। এসব নির্ণয় ও নির্দেশের জন্য ইসলামের সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড রয়েছে। এ মানদণ্ডের স্বরূপ-প্রকৃতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও বিচার বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের অনুসন্ধিৎসার বিষয়। মূল আলোচনায় মনোনিবেশের পূর্বে ইসলামি নৈতিকতার স্বরূপ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

ইসলামি নৈতিকতার স্বরূপ

মানুষের মৌলিক বিশ্বাস তার মন-মনন, চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি, জগৎ ও জীবনবোধকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ বোধ থেকে তার আচরণ পরিচালিত হয়। এ থেকে নির্ধারিত হয় তার নৈতিকতা, চরিত্র-মাধুর্য আর সৌষ্ঠবমণ্ডিত হয় তার ব্যক্তিত্ব। ইসলামে মানুষের নৈতিকতা, চরিত্র-ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির মূল ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদে বিশ্বাস। তাওহীদে বিশ্বাস বলতে বুঝায় – আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি কারো মুখাপেক্ষী

* মোঃ ইউনুস, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নন। কারও উপর তাঁর নির্ভরশীলতা নেই । তিনি স্বয়ম্ভূ। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। (আল কুরআন, ১১২ : ১-৪) তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সবকিছুর স্রষ্টা, তিনিই আদি-অন্ত, তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, তিনি বিচার দিবসের মালিক। সকল মানুষ তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তিত হবে। (আল কুরআন, ২:২৯, ২০ ; ৬:১০২ ; ৫৭:৩ ; ৩:২৬ ; ১:৩; ২:২৮) তাওহীদে বিশ্বাস এ শিক্ষা দেয় যে, এই পার্থিব জীবনের প্রত্যেক কর্মের জন্য মানুষকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। তার প্রত্যেক কর্মই ঐশী ব্যবস্থাপনায় লিপিবদ্ধ ও নথিভুক্ত হয়। পুণ্য কাজের জন্য মরণোত্তর জীবনে সে পুরস্কৃত হবে আর গর্হিত ও মন্দ কাজের জন্য মরণোত্তর জীবনে সে যন্ত্রণাক্লিষ্ট শাস্তিতে নিপতিত হবে। এ বিশ্বাস ও ধারণা থেকে ইসলাম মানুষের ঐচ্ছিক আচরণ তথা নৈতিক কার্যাবলি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ দেয়।

ইসলামি নৈতিকতার মূল স্পৃহা হচ্ছে মানুষের জন্য যা কল্যাণকর তা করা এবং যা অকল্যাণকর বা ক্ষতিকর তা পরিহার করা। এর আরেকটি স্পৃহা হচ্ছে কল্যাণকর কাজের জন্য অন্যকে আদেশ দেওয়া ও অনুপ্রাণিত করা এবং অকল্যাণ-অমঙ্গল ও ক্ষতিকর কাজে অন্যকে বাধা দেওয়া এবং অন্যায়-অপকর্ম প্রতিরোধ করা। মানুষের কল্যাণকামিতার মধ্যেই মুসলিমদের শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রয়েছে বলে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেন – "তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা মানুষদেরকে ন্যায় পথ দেখাবে আর অন্যায় পথ থেকে বিরত রাখবে এবং বিশ্বাস রাখবে আল্লাহর প্রতি।" (আল কুরআন, ৩:১১০) সৎকর্ম তথা নৈতিক কাজ না করলে এবং সৎকর্মের উপদেশ না দিলে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আল্লাহ বলেন, "কালের শপথ! নিশ্চয় মানবজাতি ক্ষতিগ্রস্ত। কেবল তারা নয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে। আর তারা যারা সত্য-সঠিক পথের প্রতি পরস্পর উপদেশ দেয় এবং ধৈর্যধারণের জন্য পরস্পরকে নসীহত করে।" (আল কুরআন, ১০৩ : ১-৩) ইসলাম আমলে সলেহ[১] বা সৎকর্মকে মুক্তির শর্ত হিসেবে গণ্য করে। সামাজিক জীব হিসেবে সহসৃষ্টি এবং সৃষ্টজীবের প্রতি সৎকর্ম তথা নৈতিক ও মানবিক দায় থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক। ইসলাম এ দায়কে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা ও পরকালীন মুক্তির জন্য অপরিহার্য ঘোষণা করেছে। আল্লাহ্ বলেন, "(হে মুহাম্মাদ) আপনি শুভ সংবাদ দিন তাদের যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সলেহ তথা সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত...।" (আল কুরআন, ২ : ২৫, ৮২)

মানুষ একাকী জীবনযাপন করতে পারে না। বেঁচে থাকার তাগিদে সহসৃষ্টি এবং অন্যান্য সৃষ্টজীবের প্রতি তাকে সম্পৃক্ত ও নির্ভরশীল হতে হয়। এ সম্পৃক্ততা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্কের মধ্যেই নৈতিকতা অবলম্বন করতে হয়। ইসলাম জীবনের পরতে পরতে নৈতিকতাকে আবশ্যিক করে দিয়েছে। দাম্পত্য জীবন শুরুর কথাটি বিবেচনা করা যাক। একজন যুবকের বিয়ে করার জন্য ইসলাম মোহর ফরজ করে দিয়েছে। (আল কুরআন, ৪:৪) এটা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর একটি গুরু দায়িত্ব। এটি লঙ্ঘন করা ইসলামে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এটা একটা ধর্মীয় দায়িত্ব। কিন্তু এর মধ্যেইতো নিহিত রয়েছে অকৃত্রিম নৈতিকতা। এভাবে আমৃত্যু স্ত্রীর প্রতি স্বামীর নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। আবার স্বামীর প্রতিও স্ত্রীর ধর্মীয় ও অকৃত্রিম নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। এরপরে মাতাপিতার নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে সন্তান-সন্ততির উপর। আবার সন্তান-সন্ততিরও মাতাপিতার প্রতি সুনির্দিষ্ট নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। অতঃপর নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতি। এভাবে চলতে-ফিরতে, বেচাকেনা, লেনদেন প্রভৃতির ক্ষেত্রে একজনের অপরজনের প্রতি যে সম্পর্ক ও মিথস্ক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাতে নৈতিকতার সূত্র গ্রন্থিত রয়েছে। ইসলাম এ নৈতিকতাকে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করেছে। আল্লাহ বলেন,

> আল্লাহর দাসত্ব করো এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। আর পিতামাতার সাথে এহসান করো। এবং আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকিন, নিকটতম প্রতিবেশী, দূরতম প্রতিবেশী, চলাফেরার সময় যাদের সাথে মিলিত হও, মুসাফির যে পথ চলতে অক্ষম হয়ে পড়েছে, এবং তোমাদের অধীনস্তদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয় আল্লাহ এমন লোকদেরকে পছন্দ করেন না যারা দাম্ভিক। (আল কুরআন, ৪:৩৬)

এভাবে ইসলাম ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং ব্যবসায়িক লেনদেন প্রভৃতিতে নৈতিকতা অটুট রাখার নির্দেশ প্রদান করে। সত্য কথা বলা, কথা ও কাজে সংগতি থাকা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা, ইনসাফের নীতি অবলম্বন করা, আমানত রক্ষা করা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি ইসলামি নীতিবিদ্যা গুরুত্বারোপ করে। (আল কুরআন, ৩৩:৭০; ৬১:৩; ২:৪০; ৪:১৩৫, ৫৮) অনুরূপভাবে ইসলাম ব্যভিচার, মদপান, জুয়া, জাদুটোনা, সুদ-ঘুষ, অন্যের সম্পত্তি আত্মসাৎ করা, অপবাদ দেওয়া, গীবত (পরনিন্দা) করা, অন্যকে হেয় করা, মিথ্যা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, ত্রাস সৃষ্টি করা, মজুদদারী করা, জুলুম-অত্যাচার করা ইত্যাদিকে কঠোরভাবে নিষেধ করে। (আল কুরআন, ২৪:২; ২:২১৯; ৫:৯০-৯১; ২:১০২; ২৭৫:১৮৮; ৪:১১২; ৪৯:১২; ২৩:৭১; ৪:২৯-৩০) আল কুরআনের ন্যায় নবী (স.)-এর সুন্নাহতেও সৎকর্মের আদেশ এবং অসৎকর্মের নিষেধের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। নবী (স.) সৎকর্মের প্রতিযোগিতায় সদা রত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন, আবার অসৎ-অন্যায় কর্ম প্রতিরোধ ও প্রতিহত করতে তাগিদ দিয়েছেন। অন্যায় ও অনুচিত কর্ম প্রতিরোধের জন্য তিনি প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন। (*রিয়াদুস সালেহীন*, হাদিস নম্বর. ৮৭, ১৮৪) নবী (স.) ছোট-খাট ভাল কাজকেও সাদাকা (দান-খয়রাত)-এর সাথে তুলনা করেছেন। (*আল আদাবুল মুফরাদ*, হাদিস নম্বর, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৭, ২৩০) বিপরীতক্রমে, অন্যের অর্থ-সম্পদ আত্মসাাৎ করা, মিথ্যা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, চোগলখুরী করা, অগোচরে কারো নিন্দা (গীবত) করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করা, প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া, গরীব-মিসকীনকে অবহেলা করা, আর্ত-পীড়িতকে সেবা না করা, পোষ্য প্রাণীকে আহার-বিহারে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদিকে গর্হিত কাজ বলে অভিহিত করেছেন। আবার, নৈতিকতার অনেক বিষয় নবী (স.)-এর ইন্তেকালের পর উদ্ভূত হয়েছে, সমকালেও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে – এরকম হওয়াই স্বাভাবিক। নতুন যুগ ও পরিবেশ-পরিস্থিতিতে উদ্ভূত নৈতিক সমস্যার নীতি ও মানদণ্ডও রয়েছে ইসলামে। উদ্ভূত নব নৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য ইসলাম ইজতিহাদ (গবেষণা), চিন্তা, বিচার-বুদ্ধি ইত্যাদি উন্মুক্ত রেখেছে। এককথায় কুরআন ও নবী (স.)-এর সুন্নাহ ছাড়াও নৈতিকতা নির্ণয়ে ইসলামের বিবিধ মানদণ্ড রয়েছে। নিম্নে নৈতিকতার এসব মানদণ্ড ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হলো।

নৈতিকতার ইসলামি মানদণ্ড

ইসলাম প্রদত্ত নৈতিকতার মানদণ্ডসমূহ মূলত দুই ধরনের। মুখ্য মানদণ্ড (Primary standard) ও দ্বৈতীয়িক মানদণ্ড (Secondary standard)। মুখ্য মানদণ্ড হচ্ছে – আল কুরআন (القران/al Qura'n) এবং আস্‌সুন্নাহ (السنة /Traditions of the great prophet sm.)। আর দ্বৈতীয়িক মানদণ্ডের মধ্যে রয়েছে – ইজমা' (الاجماع /Consensus of juristic opinion), কিয়াস (القياس /Juristic deduction), ইসতিহসান (الاستحسان /Juristic equity), মাসালিহে মুরসালাহ (مصالح مرسلة /Public good), সাদ্দুয যারায়ে (سد الذرائع/Obstruvcting the means), আল ইসতিসহাব (الاستصحاب / Legal presumption), সাহাবী ও তাবেঈনদের 'আমল ও অভিমত (Practices and opinions of companions of the Prophet sm. and practices and

opinions of tabe‘in), ‘উরফ (العرف / Good customs), প্রচলিত আইন (Customary laws) প্রভৃতি। দ্বৈতীয়িক মানদণ্ডসমূহকে ইজতিহাদ (গবেষণা), চিন্তা, বুদ্ধি ও যুক্তিভিত্তিক বলে অভিহিত করা যায়। নিম্নে এ মানদণ্ডগুলোর বিভিন্ন প্রকার আলোচনা করা হলো :

১। মুখ্য মানদণ্ড (Primary standard)

১.১. আল কুরআন (القران/al Qura’n)

আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে সর্বশেষ গ্রন্থ হচ্ছে আল কুরআন। আল কুরআনের কেন্দ্রিয় বিষয় হচ্ছে মানুষ। অর্থাৎ মানুষের পার্থিব ও মরণোত্তর জীবনের কল্যাণ-অকল্যাণ, মঙ্গল-অমঙ্গল, লাভ-লোকসান, ভাল-মন্দ ইত্যাদির নির্দেশনাই আল কুরআনের মূল প্রতিপাদ্য। ভারতবর্ষের বিখ্যাত দার্শনিক শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র.) আল কুরআনের বিষয়বস্তুকে[২] পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা: ক) আদেশ-নিষেধ; খ) পথভ্রষ্ট দলসমূহের বাদানুবাদ; গ) প্রকৃতিতে আল্লাহর নিদর্শন এবং মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ; ঘ) পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কিত বিষয় এবং ঙ) মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কিত বিষয়। (দেহলভী, শাহ ওয়ালি উল্লাহ, ২০০৪, ১৩) এ পঞ্চ বিষয়ের মাধ্যমে আল কুরআন মানবজীবনের সর্বদিকের পথ ও পাথেয় নির্দেশ করে থাকে।

মানুষ সসীম। শারীরিক এবং মানসিক সীমাবদ্ধতা ছাড়াও তার চিন্তা ও বুদ্ধিগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। পর্যবেক্ষণলব্ধ কিছু জ্ঞান তার আছে। কিন্তু তা দিয়ে সে তার জীবনের জন্য নিখুঁত বিধান রচনা করতে পারে না। কেননা জগতের ভূত-ভবিষ্যৎ তার জ্ঞানে নেই। এ কারণে অনেক ধীসম্পন্ন ব্যক্তিকেও আমরা বয়সের বিভিন্ন বাঁকে মত পাল্টাতে দেখি। অর্থাৎ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চিন্তা ও সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করতে দেখি। মানুষের সসীমতার কারণেই তার পক্ষে নিখুঁত জীবনবিধান রচনা করা সম্ভব নয়। নিখুঁত ও পরিপূর্ণ জীবনবিধান কেবল স্রষ্টার পক্ষেই প্রদান করা সম্ভব। কেননা তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্বদ্রষ্টা। এমন মহান প্রভুর দেওয়া বিধানেরই নাযিলকৃত গ্রন্থিতরূপ হচ্ছে ‘আল কুরআন’। তাই এ কথা বলা যায় যে, মানুষের সীমাবদ্ধতার কারণেই তার জীবন পরিচালনার জন্য ঐশী নির্দেশনা তথা আল কুরআন অপরিহার্য।

মানুষকে আল কুরআন ব্যতীত অন্য কোনো মত ও পথের দিকে ধাবিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা আল্লাহ কুরআনকে বিশদ বর্ণনা সম্বলিত করে অবতীর্ণ করেছেন। (আল কুরআন, ৬:১১৪; ১৬:৮৯) “এর আয়াতসমূহ দলীল-প্রমাণ দ্বারা সুদৃঢ় করা হয়েছে এবং এমন এক প্রভুর পক্ষ থেকে এতে বিশদ বর্ণনা রয়েছে, যিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।” (আল কুরআন, ১১:১) আল কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি স্পষ্ট নূর (জ্যোতি)। (আল কুরআন, ৪:১৭৪; ৫ :১৫-১৬) এ কিতাব মহান আল্লাহ নবী মুহাম্মাদ (স.)-এর নিকট অবতীর্ণ করেছেন যা দিয়ে নবী (স.) মানুষদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসেন। (আল কুরআন, ১৪:১) আল কুরআন হচ্ছে ঐশী জ্যোতি। এ জ্যোতি মানবজীবনের অন্ধকার দূর করে তাকে ঐশী আলোতে স্নাত করে। মানবজীবনে আলোর দিশা দেয়। তাহলে মানবজীবনে অন্ধকার ও আলো কী?

মানুষ যদি নিজেকে না চেনে, না জানে, নিজের উদ্ভব-বিকাশ-পরিণতি এবং জীবনের উদ্দেশ্য, কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে উদাসীন ও গাফেল থাকে, তাহলে সে অন্ধকারে নিমজ্জিত আছে। সে যদি নিজের মনিবকে ভুলে যায়, প্রতিপালকের আদেশ-নিষেধ পালন না করে, স্রষ্টার অবাধ্য হয় এবং স্রষ্টার স্থলে অন্য কাউকে প্রভু মনোনীত করে এবং সে সত্তার আনুগত্য করে, প্রবৃত্তির দাসত্ব করে, পাপ-পঙ্কিলতায় লিপ্ত থাকে, তাহলে সে অন্ধকারে নিমজ্জিত আছে। অন্ধকারে নিপতিত ব্যক্তি পথ হারিয়ে ফেলে,

ভুলপথে পরিচালিত হয়, নিজেকে বিপথে নিয়ে যায় এবং নিজেকে বিপদগ্রস্ত করে। এ মানুষ পৃথিবীতে স্বীয় জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলে যায়। দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়। মনিব ও স্রষ্টার দাসত্ব না করে প্রবৃত্তির গোলামী করে। হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, পরশ্রীকাতরতা তাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে আবিষ্ট করে। হানাহানি, রাহাজানি, লুট-তরাজ, গোষ্ঠীভেদ, জাতিভেদ, আভিজাত্য ও আধিপত্যের প্রতিযোগিতায় সে মানবতার ক্ষতি করে অহর্নিশ। দুর্নীতি-দুষ্কৃতি, অন্যায়-অনাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন ইত্যাদি সে সিদ্ধ হস্তে সম্পাদন করে। এ অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষটির মন-মস্তিষ্ক, চিন্তা-চেতনা বিকৃত হয়ে যায়। এ বিকৃতির প্রতিফলন ঘটে তার আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডে। এ অন্ধকার দূর করার জন্য প্রয়োজন পড়ে আলোর। অন্ধকারের ঘনত্ব যত বেশি হয় আলোর তীব্রতাও তত বেশি প্রয়োজন পড়ে। অন্য কথায়–টর্চ বা বাল্বের শক্তি যত বেশি হয়, অন্ধকার তত বেশি দূরীভূত হয়। মানবজীবনে অন্ধকার যেহেতু তার মন-মস্তিষ্ক, চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও হৃদয়ে গ্রন্থিত থাকে সে কারণে তার এ অন্ধকার থেকে মুক্তির জন্য নিখুঁত ও সদা সমুজ্জ্বল আলোর প্রয়োজন। মানবের জন্য এ আলো হচ্ছে তার স্রষ্টা প্রদত্ত আলো-রশ্মি, শাশ্বত জ্যোতি। এ জ্যোতিরই গ্রন্থিত রূপ হচ্ছে আল কুরআন।

মানুষের জীবনকে অর্থবহ করার জন্য তার নিখুঁত জীবনবিধান প্রয়োজন। এ বিধানে তার জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, সফলতা-ব্যর্থতা, করণীয়-বর্জনীয়, মঙ্গল-অমঙ্গল, কল্যাণ-অকল্যাণ, লাভ-লোকসান, ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি নির্দেশনা থাকা বাঞ্ছনীয়। এ সবের সুস্পষ্ট, নিখুঁত ও পরিপূর্ণ নির্দেশনা রয়েছে আল কুরআনে। আল কুরআন হক ও বাতিল, সঠিক ও ভ্রান্ত, কল্যাণ ও অকল্যাণ, উচিত-অনুচিত, বৈধ-অবৈধ – এককথায় মানবজীবনের সর্বদিকের সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য করে আল কুরআন। এ কারণে আল কুরআনকে আল ফুরকান (الفرقان : সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড) বলে অভিহিত করা হয়। আল কুরআনকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড হিসেবেই অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ বলেন, "অতি মহান তিনি, যিনি তাঁর বান্দার উপর (সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড) 'ফোরকান' অবতীর্ণ করেছেন, যাতে করে সে (মুহাম্মাদ) সৃষ্টিকুলের জন্য সতর্ককারী হতে পারে।" (আল কুরআন,২৫:১)

১.২. আস্সুন্নাহ (السنة /Traditions of the great prophet sm.)

ইসলামি নৈতিকতার দ্বিতীয় মুখ্য উৎস হচ্ছে আস্সুন্নাহ (السنة)। মানবজীবনে করণীয়-বর্জনীয়, উচিত-অনুচিত, কল্যাণ এবং অকল্যাণের নির্দেশনা রয়েছে আস্সুন্নাহতে। সুন্নাহ হচ্ছে নবী মুহাম্মাদ (স.)-এর কথা (বাণী), কাজ এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনুমোদন। আল কুরআনের ব্যাখ্যা ও বাস্তব নমুনা চিত্রায়িত হয়েছে মহানবী (স.)-এর সুন্নাহ-এর মাধ্যমে। আভিধানিক অর্থে সুন্নাহ শব্দের অর্থ হলো "তরীকা, কর্মপন্থা পদ্ধতি।" আর পারিভাষিক অর্থে সুন্নাহ হলো – "ঐ সব উক্তি, কাজ, স্বীকৃতি, আকৃতি বা প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণিত কোন গুণ বা চরিত যা নবী (স.) হতে বর্ণিত।" (আস্সুবায়ী, মুস্তফা হুস্নী, ২০০৪, ২১)

সুন্নাহ পালনের মাধ্যমে আল্লাহকে মান্য করা হয়। আল্লাহ বলেন, "যে রাসূলের আনুগত্য করল সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করল।' (আল কুরআন, ৪:৮০) রাসূলের সুন্নাহ ব্যতীত আল্লাহর আনুগত্য করা যায় না। রাসূল (স.)-এর সুন্নাহ নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া একজন বিশ্বাসীর জন্য অপরিহার্য। আল্লাহ বলেন, "(হে নবী) তোমার প্রভুর শপথ, তারা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের যাবতীয় মতবিরোধের ফয়সালায় (শর্তহীনভাবে) তোমাকে বিচারক মেনে নিবে, তোমার ফয়সালায় তাদের কোন ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকবে না এবং তোমার সিদ্ধান্ত তারা সর্বান্তকরণে মেনে নিবে।" (আল কুরআন, ৪ :৬৫) আবার আল্লাহ বলেন, "কোন বিষয়ে তোমরা যদি একে অপরের সাথে মতবিরোধ কর, তাহলে সে বিষয়টি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।"

(আল কুরআন, ৪:৫৯) আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলই নৈতিকতার প্রধান মানদণ্ড। মানুষের কী করণীয়, কী বর্জনীয়, উচিত-অনুচিত, ভাল-মন্দ ইত্যাদির নির্দেশনা রয়েছে কুরআন এবং সুন্নাহতে।

আল কুরআনে নৈতিকতার মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিকতা ইত্যাদির বিধান ঘোষিত হয়েছে। নবী (স.)-এর সুন্নাহতে এ নীতিসমূহ সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। উল্লিখিত বিষয়ে ঔচিত্য ও কর্তব্যের পরিসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে নবী (স.)-এর সুন্নাহর মাধ্যমে। অর্থাৎ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন দিকে নৈতিক কর্তব্যের আওতা, সীমা, পরিধি নির্ধারণ ও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে নবী (স.)-এর সুন্নাহর দ্বারা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আল কুরআনের বাণী – "তোমরা একে অপরের ধন-সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, তবে ব্যবসায়-বাণিজ্য (বৈধ পন্থায়) পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে করবে।" (আল কুরআন, ৪:২৯) এ আয়াতে ব্যবসায়র মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত পদ্ধতি ও উপায়েরর বর্ণনা এখানে নেই। সুন্নাহর মধ্যে এর বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। সুন্নাহতে নির্দেশিত হয়েছে ব্যবসায়ের কোন্ পদ্ধতি বৈধ আর কোন্ পদ্ধতি বৈধ নয়। বৈধ ব্যবসায়ের জন্য কী কী বৈশিষ্ট্য ও শর্তাবলি থাকা প্রয়োজন। (রশীদ, আবদুর প্রমুখ, ২০১১, ৮৪) আল কুরআনে চোরের শাস্তির মূলনীতি হচ্ছে – "চোর পুরুষ অথবা নারী তাদের হাত কেটে দাও।" (আল কুরআন, ৫:৩৮) আল কুরআনে কেবল হাত কর্তনের কথা আছে। পক্ষান্তরে সুন্নাহ-এর মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়েছে যে, কোন ধরনের ও পরিমাণের চুরির জন্য হাত কর্তন করা হবে এবং হাতের কতটুকু কর্তন করা হবে।

নৈতিক কার্যাদিকে ইসলাম পুণ্যের সাথে এবং অনৈতিক কার্যাবলিকে পাপের সাথে সম্পৃক্ত করে। নৈতিকতার ধারণা থেকে সৎকাজ বা নেকআমলের ধারণা অতি ব্যাপক। নৈতিক কাজ সমাজবদ্ধ মানুষের সাথে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সাথে যুক্ত। আর নেকআমল নৈতিক কাজের পাশাপাশি মানবিক কাজকেও অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন, দয়া-দাক্ষিণ্য, বদান্যতা, প্রেম, সহানুভূতি, মমতা ইত্যাদি মানবিক কাজ। আবার, সৎকাজ তথা নেকআমল নৈতিক কাজকেও অন্তর্ভুক্ত করে। সৎ ও নৈতিক কাজ করতে আস্সুন্নাহ প্রতিযোগিতার নির্দেশ দেয়। নবী মুহাম্মাদ (স.) বলেন, "তোমরা এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে সৎকাজ (নৈতিক ও মানবিক)-এর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাক।" (*রিয়াদুস সালেহীন*, হাদিস নম্বর. ৮৭) ইসলামে সাদাকা (দান-খয়রাত) করা অত্যন্ত উঁচু মানের সৎকাজ। কুরআন এবং হাদিসে সাদাকাহর বহুবিধ মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। নবী (স.) নৈতিক কাজকে সাদাকাহর সমপর্যায়ভুক্ত বলে অভিহিত করেছেন। নবী বলেন, "সৎকাজের নির্দেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করাও হচ্ছে সাদাকা।" (*রিয়াদুস সালেহীন*, হাদীস নম্বর, ১১৮) অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করে ন্যায় ও সৎকাজ প্রতিষ্ঠা করা একজন মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। নবী মুহাম্মাদ (স.) বলেন, "তোমারা কেউ যখন মন্দ কাজ ঘটতে দেখে সে যেন তা হাত দিয়ে (অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে) প্রতিরোধ করে পরিবর্তন করে দেয়। যদি সে এই সক্ষমতা না রাখে তবে যেন মুখের (কথার) দ্বারা তা (জনমত গঠনের মাধ্যমে) পরিবর্তন করে দেয়। যদি এ সক্ষমতাও না রাখে তবে যেন সে অন্তরের দ্বারা (সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে) তা প্রতিরোধ করে পরিবর্তন করে দেয়। এটি ঈমানের দুর্বলতম স্তর।" (*রিয়াদুস সালেহীন*, হাদিস নম্বর, ১৮৪) বিপরীতক্রমে নবী (স.)-এর সুন্নাহ-এ অনৈতিক ও গর্হিত কাজের ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন গীবত (কারো অগোচরে তার দোষ/খুঁত চর্চা) করা, চোগলখুরী করা, মিথ্যা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দান করা, অভিশাপ দেওয়া, অন্যায়ভাবে গালি দেওয়া ইত্যাদি। একইভাবে পরস্পর ঘৃণা, হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা, গোয়েন্দাগিরি করা, প্রতারণা করা, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা, ঋণ পরিশোধ না করা বা পরিশোধে বাহানা করা, অশ্লীল কথা বা গালমন্দ করা, কোন প্রাণী এমনকি পিঁপড়াকে আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়া ইত্যাদি হারাম কাজ।

আল কুরআন এবং সুন্নাহতে যে সকল কাজকে নৈতিক ও উত্তম বলে অভিহিত করা হয়েছে তা প্রকৃতিগতভাবেই শুভ ও মঙ্গল। যেমন সৎকাজের আদেশ দেওয়া। সৎকাজের আদেশের মধ্যে অন্যের মঙ্গল কামনা করা হয়। এতে সমাজের মঙ্গল সাধিত হয়। সমাজে উত্তম কাজের প্রসার ঘটে। আবার আল কুরআন এবং সুন্নাহতে যে সকল কাজ নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করা হয়েছে তা প্রকৃতিগতভাবেই খারাপ, মন্দ ও ক্ষতিকর। উপরে বর্ণিত হারাম কাজসমূহ ব্যক্তি ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর। ঐসব কাজ ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে অমঙ্গল, পাপাচার, বিশৃঙ্খলা ও ক্ষতির বিস্তার ঘটায়। ইসলামি শরী'আত মূলত যা পবিত্র তাই হালাল করে আর যা অপবিত্র তা হারাম করে। (আল কুরআন, ৭:১৫৭)

২) দ্বৈতীয়িক মানদণ্ড (Secondary standard)

২.১. ইজমা (الاجماع /Consensus of juristic opinion)

নৈতিকতার তৃতীয় ইসলামি মানদণ্ড হচ্ছে ইজমা। নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবদ্দশায় সাহাবীগণ কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে নবী (স.)-এর শরণাপন্ন হতেন। নবী (স.) ওহী বা ইলহামের মাধ্যমে সে সমস্যার সমাধান দিতেন। নবীউত্তরকালে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ফলে বহু নতুন সমস্যা, পরিস্থিতি মুসলিমদের নিকট উত্থাপিত হয়। মুসলিম পণ্ডিত, আইনজ্ঞ এবং গবেষকেরা এসব বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথের উদ্ভব ঘটে। এ মতসমূহের মধ্যে সংহতি বিধানের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইজমা নীতির উদ্ভব ঘটে। ইজমা হচ্ছে কোনো বিষয়ে ঐকমত্য পোষণের নীতি। ইজমা সাহাবা (রা.)-দের যুগে সাহাবা (রা.)-দের কোনো বিষয়ের ঐকমত্য এবং পরবর্তীতে বিজ্ঞ ফকীহদের মতের ঐকমত্যকে বোঝায়। (Doi ‘Abdur Rahim, 1997, 64) "ইজমা বলতে যে কোন যুগের স্বীকৃত মুজতাহিদগণের সর্বসম্মত ঐকমত্যকে বোঝায়।" (এমরান, সৈয়দ শাহ, ২০১৯, ২১৩)

মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধভাবে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেই তা ইজমা নয়। ইজমার জন্য ইজমা গ্রহণকারীদের মুজতাহিদ (যাদের গবেষণার যোগ্যতা আছে) হতে হবে এবং ইজমা কুরআন-সুন্নাহর স্পৃহার পরিপন্থী হতে পারবে না। "রাসূলে করীম (স.)-এর পর কোন এক সময়কার মুসলিম উম্মতের সমস্ত মুজতাহিদ সম্পূর্ণ একমত হয়ে ইজতিহাদযোগ্য বিষয়ে শরীয়াতের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিভাষায় তা-ই হল ইজমা।" (রহীম, মুহাম্মাদ আবদুর, ২০০৬, ১২৩)

ইসলাম নৈতিকতাসমৃদ্ধ একটা সমাজ ও জাতি গঠন করতে প্রয়োজনীয় সকল বিধান দিয়েছে। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের পাশাপাশি নৈতিক কর্ম নির্দেশে ইজমার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নস (কুরআন ও হাদীসের মূল টেক্সট)-এ নেই এমন বিষয়ে শর'ঈ মানদণ্ড দিয়ে থাকে ইজমা। যেমন–ব্যবসায়-বাণিজ্য করা হালাল – এ কথা কুরআন ও হাদিসে আছে। ধরা যাক, একজনের মূলধন আছে কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য তার সুযোগ ও সক্ষমতা নেই। আরেক জনের ব্যবসায় করার সুযোগ-সক্ষমতা ও দক্ষতা আছে। কিন্তু তার মূলধন নেই। কীভাবে সে ব্যবসায় করবে? এটা কি হতে পারে যে, একজনের মূলধন দিয়ে অন্যজন ব্যবসায় করে মূলধনদাতাকে মুনাফার অংশ দিবে? এ মুনাফা কি বৈধ হবে? এ মুনাফার অর্থ কি নৈতিক (জায়েজ) উপায়ে আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে? যে আয়ে অর্থ বিনিয়োগে শারীরিক ও মানসিক শ্রম দেওয়া হয়নি তা কি ন্যায় হতে পারে? মুজতাহিদগণ (গবেষকগণ)-এর মতে, এমতাবস্থায় ব্যবসায় বৈধ হতে পারে। এই উভয় পক্ষ নির্দিষ্ট হারে লাভ-লোকসানে অংশীদার হওয়ার শর্তে এই অংশীদারিত্বের ব্যবসায় বৈধ। মুজতাহিদ ফকীহগণ এ বিষয়ে

ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অর্থাৎ এ বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (আবদুল্লাহ, আবু ছাইদ মোহাম্মদ, ১৯৯৭, ১৭)

সাহাবী (রা.)-দের ইজমার কতিপয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ দৃষ্টান্তগুলো নৈতিকতার উঁচু স্তরের উৎকর্ষ প্রমাণ করে। "মুসলমান মেয়েকে অমুসলিম পুরুষের নিকট বিবাহ দেওয়া জায়েজ নয়, দাদীকে মিরাসের এক ষষ্ঠাংশ দিতে হবে এবং যাকাত দিতে অস্বীকারকারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রয়োজন হলে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।" (রহীম, মুহাম্মদ আবদুর, ২০০৬, ১২৩) এসব বিষয়ে সাহাবা (রা.)-দের ইজমা রয়েছে।

সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আদালত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে থাকে। কিন্তু সাক্ষীর অনৈতিকতা প্রমাণিত হলে সাক্ষ্য প্রদানের অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এ বিষয়ে ইজমা হয়েছে যে, কেউ যদি কবীরা গুনাহ[৩] করে, অথবা প্রকাশ্যভাবে সগীরা গুনাহ[৪] করে অথবা কবীরা গুনাহ করার দৃঢ় সংকল্পের প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে তার সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়। (ইবনে আহমাদ, আলী, *মারাতিবুল ইজমা*, তা.বি. ৫৩; আমিন, মুহাম্মদ রুহুল, ২০১৩, ১০৮ থেকে উদ্ধৃত,) ইদ্দত[৫] চলাকালীন সময় বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হারাম (চরমভাবে নিষিদ্ধ ও অনৈতিক কাজ)। রজঃস্রাব চলা অবস্থায় স্ত্রীর যৌনাঙ্গ অথবা পশ্চাৎ দিক দিয়ে সহবাস করা হারাম (চরম নিষিদ্ধ ও অনৈতিক কাজ) (ইবনে আহমাদ, আলী, *মারাতিবুল ইজমা*, তা. বি. ৬৯-৭০; আমিন, মুহাম্মদ রুহুল, ২০১৩, ১০৯ থেকে উদ্ধৃত)। খনিজ সম্পদ নেই এমন কোনো পতিত জমিতে যদি কোনো ব্যক্তি আবাদ করে, তাহলে ঐ ব্যক্তির নিকট থেকে উক্ত ভূমি মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের নিয়ে নেওয়ার কোন অধিকার নেই। (ইবনে আহমাদ, আলী, *মারাতিবুল ইজমা*, তা. বি. ৯৫, আমিন, মুহাম্মদ রুহুল, ২০১৩, ১০৯ থেকে উদ্ধৃত)। যার উপর ব্যভিচার, মদ্যপান, অপবাদ ও হত্যার হদ্দ[৬] (শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সীমা) পাওয়া যায়, তাকে হত্যা করা আবশ্যক হয়ে পড়ে (ইবনে আহমাদ, আলী, *মারাতিবুল ইজমা*, তা. বি. ১২৯, আমিন, মুহাম্মদ রুহুল, ২০১৩, ১০৯ থেকে উদ্ধৃত)

উল্লিখিত বিষয়াবলি ইসলামি শরী'আতের ধর্মীয় বিষয় যেমন, তেমনি এগুলো উন্নত নৈতিকতাকে নির্দেশ করে। তাহলে বলা যায় যে, ইজমা নৈতিক ও অনৈতিক কার্য নির্ণয় করে। তাই ইজমা নৈতিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড।

২.২. **কিয়াস** (القياس /Juristic deduction)

নৈতিকতার চতুর্থ ইসলামি মানদণ্ড হচ্ছে কিয়াস। কিয়াসকে পাশ্চাত্য যুক্তিবিদ্যার সাদৃশ্যানুমান (analogy)-এর সাথে তুলনা করা যায়। সাদৃশ্যানুমানে দুটি বিষয়ের মধ্যে একাধিক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলে তাদের একটির অতিরিক্ত জ্ঞাত গুণ অন্যটির মধ্যে থাকবে এরূপ অনুমান করা হয়। সমতা ও সাদৃশ্য হচ্ছে এ অনুমানের ভিত্তি। কিয়াসের ক্ষেত্রে এ সমতা ও সাদৃশ্যকে 'ইল্লাত'[৭] (علة/সাদৃশ্যের ভিত্তি) বলে অভিহিত করা হয়। ফকীহগণের পরিভাষায় "ইল্লাতের ভিত্তিতে পূর্ববর্তী ফয়সালা ও নযীরের (দৃষ্টান্ত)-এর আলোকে নতুন সমস্যা সমাধানের সন্ধান করাকে কিয়াস বলা হয়।" (এমরান, সৈয়দ শাহ, ২০১৯, ৪১৩) যেমন, গাঁজা, আফিম ইত্যাদি হারাম হওয়ার ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমায় কোনো নির্দেশনা নেই। তাহলে গাঁজা সেবন বৈধ না অবৈধ সে বিষয়ে কীভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য গাঁজা এবং আফিমের ইল্লাতের সাথে আল কুরআন, অথবা হাদিস অথবা ইজমার কোনো বিষয় সম্পর্কে যে বিধান রয়েছে সে বস্তুর ইল্লাতের যদি সাদৃশ্য থাকে তাহলে পূর্বে নির্ধারিত বিষয়ের বিধানই গাঁজা-আফিম ইত্যাদি সেবনেরও বিধান হবে। গাঁজা-আফিম

ইত্যাদির ব্যবহার মাতালতা-নেশাগ্রস্ততা সৃষ্টি করে। মদপানও মাতালতা-নেশাগ্রস্ততা সৃষ্টি করে। (আল কুরআন; ৫:৯০-৯১) মদপান ও গাজা-আফিমপানের কার্যফলে সাদৃশ্য আছে। এদের 'ইল্লাত অভিন্ন। মদপান ও গাজা-আফিমপানের কার্যফলের মধ্যে 'ইল্লাত তথা সাদৃশ্য হচ্ছে মাতালতা ও নেশাগ্রস্ততা সৃষ্টি করা। মদপানের বিষয়ে আল কুরআনের সুর্দিষ্ট বিধান রয়েছে, আর তা হচ্ছে হারাম। গাঁজা ও আফিমের বিষয়ে আল কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমার কোন বিধান নেই। যেহেতু মদের 'ইল্লাত এবং গাঁজা ও আফিমের ইল্লাতে (মাতালতা) সাদৃশ্য রয়েছে। অতএব গাঁজা ও আফিম সেবনও হারাম হবে। এমন প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণই হচ্ছে কিয়াস।

সাদৃশ্যানুমানের মাধ্যমে এ উদাহরণটিকে প্রকাশ করা যায় এভাবে : মদপান নেশা ও মাতালতা সৃষ্টি করে মদপান করা হারাম (কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা নির্ধারিত) গাঁজা-আফিম সেবন নেশা ও মাতালতা সৃষ্টি করে অতএব, গাঁজা-আফিম সেবনও হারাম (কিয়াস দ্বারা নিঃসৃত সিদ্ধান্ত) উভয়ের কার্যফলের মধ্যে সাদৃশ্যের ভিত্তি হচ্ছে নেশা বা মাতালতা সৃষ্টি হওয়া।

আরেকটি উদাহরণ বিশ্লেষণ করা যাক। ইসলামি নৈতিকতায় লটারি বৈধ কিনা। এটির বিধানও কিয়াসের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়। লটারি সম্পর্কে কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমায় সরাসরি কোনো বিধান নেই। লটারির মাধ্যমে ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে অন্যের অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করা হয়। জুয়াখেলায়ও ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে অন্যের অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করা হয়। আল কুরআনে আমরা জুয়ার অবৈধতা সম্পর্কে বিধান পাই। আর তা হচ্ছে হারাম। (আল কুরআন; ৫: ৯০-৯০) জুয়াখেলা ও লটারির মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। জুয়াখেলা হারাম, অতএব লটারিও হারাম হবে। কিয়াস তথা সাদৃশ্যানুমানের মাধ্যমে এ উদাহরণটিকে প্রকাশ করা যায় এভাবে :

জুয়াখেলায় ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে অন্যের অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করা হয় জুয়াখেলা হারাম। (কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা নির্ধারিত) লটারিতেও ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে অন্যের অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করা হয় অতএব লটারিও হারাম। (কিয়াস দ্বারা নিঃসৃত সিদ্ধান্ত) উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যের ভিত্তি হচ্ছে ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া।

তাহলে এটি স্পষ্ট হল যে, কিয়াসের মাধ্যমে ঐচ্ছিক ক্রিয়ার বৈধতা-অবৈধতা, ন্যায়ত্ব-অন্যায়ত্ব নির্ণয় করা যায়। তবে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায় নেই এমন বিষয়ে কিয়াস করতে হবে। আবার, যেটি মূল (اصل) অর্থাৎ যার সাথে সাদৃশ্য করা হয়, তার বিধান কুরআন অথবা সুন্নাহ অথবা ইজমার দ্বারা নির্ধারিত থাকতে হবে। যে কেউ কিয়াস করতে পারবে না। কেবল মুজতাহিদগণ কিয়াসের মাধ্যমে বিধান নির্ধারণ করতে পারবেন। মুজতাহিদ কাকে বলে? "শরী'আতের পরিভাষায় ঐ ব্যক্তিকে মুজতাহিদ বলা হয় যিনি কিতাবুল্লাহর ইল্‌ম ও তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সকল নীতিমালা এবং ইল্‌মে হাদিসের সনদ, মতন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে পারদর্শী, বিশুদ্ধ কিয়াসে যোগ্যতাসম্পন্ন ও মানবসমাজের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।" (সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৯, ১৭৬)

২.৩. **ইস্‌তিহসান** (الاستحسان /Juristic equity)

ইসলামে বুদ্ধি ও যুক্তিভিত্তিক মানদণ্ডসমূহের মধ্যে ইসতিহসান অন্যতম। অবশ্য ইস্‌তিহসান ইসলামি আইনের উৎস হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহ তথা হানাফী, মালিকী ও হাম্বলী মাযহাব অনুসারে ইসতিহসান ইসলামি আইনের অন্যতম উৎস। পক্ষান্তরে, শাফে'ঈ, যাহিরী ও শী'আ মাযহাব অনুসারে ইসতিহসান ইসলামি আইনের উৎস নয়। (আমীন, মুহাম্মদ রুহুল, ২০১৩, ১৩৯)

বস্তুত, ইসতিহসান হচ্ছে কিয়াসের একটি ধরন। ইসতিহসান শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুকে উত্তম, ভালো, সুন্দর মনে করা। আক্ষরিক অর্থে দুটি ভাল কাজের মধ্যে একটিকে অধিকতর ভাল বলে পছন্দ করার নীতি হচ্ছে ইসতিহসান। (Rahim, Abdur, 2006, 157) দু'টি কিয়াসের মধ্যে একটি কিয়াসকে অধিকতর ভাল ও যুক্তিযুক্ত মনে করার নীতি হচ্ছে ইসতিহসান। ফকীহদের পরিভাষায় "ইসতিহসান হচ্ছে – এক কিয়াস পরিত্যাগ করে, তার চেয়ে বেশি যুক্তিযুক্ত কিয়াস অবলম্বন করা।" (আমিনী, মুহাম্মদ তাকী, ২০০৪, ১৪৯) আরেকটি সংজ্ঞানুসারে "একটি কিয়াসকে বাদ দিয়ে মানুষের প্রয়োজনের সাথে অধিকতর বিধানকে গ্রহণ করা।" (আমিনী, মুহাম্মদ তাকী, ২০০৪, ১৫০)

দুটি বৈধ ক্রিয়ার মধ্যে যেটি সহজতর সেটি গ্রহণ করার নীতি হচ্ছে ইসতিহসান। কেননা, ইসলাম কাঠিন্য ও কঠোরতা পরিহার করে সহজতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়। আল কুরআনে আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্মকে সহজ করে দিতে চান, আল্লাহ কখনওই তোমাদের জীবনকে কঠোর করে দিতে চান না।" (আল কুরআন, ২:১৮৫) হাদিসেও অনুরূপ নির্দেশনা রয়েছে। "লোকদের জন্য সহজতর ব্যবস্থা করবে, তাদের কঠিন ও দুর্বিষহ অবস্থায় ফেলবে না।" (রহীম, মুহাম্মদ আবদুর, ২০০৬, ১৩৩)। শরী'আতের আইন ও নৈতিকতার মানদণ্ড হিসেবে ইসতিহসানে এ নীতিই অবলম্বন করা হয়।

উদাহরণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে নৈতিকতার ইসলামি এ মানদণ্ড আরো স্পষ্ট হবে। কারো নিকট যদি কোন জিনিস আমানত রাখা হয়, এবং আমানতের বস্তু যদি আমানত থাকাকালীন সময় (আমানতদারের অবহেলা, উদাসীনতা, গাফেলতি ইত্যাদি ব্যতীত) নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমানতদার ঐ আমানতের বস্তু নষ্ট হওয়ার কারণে দায়ী হবে না। কিয়াসের নীতিমালা অনুসারে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কিন্তু পেশাদার ব্যক্তি যেমন ধোপা, রঞ্জক, দর্জি, রুটিওয়ালা প্রমুখের নিকট সংশ্লিষ্ট সেবার বস্তু নষ্ট হলে বা হারিয়ে গেলে ক্ষতিপূরণ আদায় করা বৈধ। এ সিদ্ধান্ত ইসতিহসানের ভিত্তিতে নেওয়া হয়। এখানে জনস্বার্থ ও কল্যাণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ঐ সমস্ত পেশার লোকেরা বহু সংখ্যক মানুষের বস্তু সেবার জন্য গ্রহণ করে। তারাও একার্থে আমানতদার। তাদের নিকট থেকে ক্ষতিগ্রস্ত বস্তুর ক্ষতিপূরণ আদায় না করা হলে তাদের কেউ কেউ লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে বহু লোকের সম্পদ নষ্ট বা লোপাট করবে। এতে জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জনগণকে ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য তাদেরকে দায়ী করা বৈধ। (আমিনী, মুহাম্মদ তাকী, ২০০৪, ১৫৯-১৬০) অনুরূপভাবে, নৌকা, মালবাহী জাহাজ, কুরিয়ার সার্ভিসের ভ্যান ইত্যাদি সেবাদাতার গাড়ি দুর্ঘটনায় পতিত হলে, অথবা এদের নিকট সেবার জন্য প্রদত্ত বস্তু কোনোভাবে নষ্ট হলে তাদের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা বৈধ। এ সিদ্ধান্তের ভিত্তিও ইসতিহসান। এভাবে ইসতিহসান নৈতিকতা নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

২.৪. মাসালিহে মুরসালা (مصالح مرسلة/Public good)

ইসলামি নৈতিকতার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবতার কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং অকল্যাণ দূর করা। নৈতিকতার এরকম একটি মানদণ্ড হচ্ছে মাসালিহে মুরসালা। যে সকল ক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসে সরাসরি নির্দেশনা নেই, কিন্তু কাজটি মানবতাকে ক্ষতি থেকে বাঁচায় এবং কল্যাণ নিশ্চিত করে – এ ধরনের কাজকে কর্তব্য হিসেবে নির্ধারণের নীতিই হচ্ছে মাসালিহে মুরসালা। এ নীতিতে গণকল্যাণ (Public interest)-কে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ইসলামি আইনবিদদের মতে, "মাসালিহে মুরসালা বলতে বোঝায় এমন সব বিষয় যার বিবেচনার পক্ষে শরী'আতের কোন মূলনীতি সাক্ষ্য দেয় না এবং যাকে বাতিল করার বিষয়েও সাক্ষ্য দেয় না।

অথচ সুস্থ বিবেক বিষয়গুলোকে গ্রহণ করে” (ইমাম শাতিবী, আল মাওফিকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯ ; রশীদ, আবদুর প্রমুখ, ২০১১, ১৪১ থেকে উদ্ধৃত)। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: “মুজতাহিদগণ কাজের মধ্যে প্রাধান্যযোগ্য কল্যাণ নিহিত আছে বলে মনে করেন এবং শরী‘আতে উক্ত কাজের বিরোধী কোন নির্দেশনা বিদ্যমান নেই, তাকে মাসালিহে মুরসালা বলা হয়।” (ইমাম শাতিবী, *মাজমুআতুর রাসাইল ওয়াল মাসাইল*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২ ; রশীদ, আবদুর প্রমুখ, ২০১১, ১৪১ থেকে উদ্ধৃত)

একটি উদাহরণ বিশ্লেষণ করলে মাসলিহে মুরসালা নীতিটি আরো স্পষ্ট হবে। যেমন কোনো ব্যক্তি মৃত্যু শয্যায় শায়িত থাকাকালে মীরাস থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে তালাক দিল। এখন এই স্ত্রী উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি (মিরাস) পাবে কিনা। ইসলামের নীতি হচ্ছে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী মীরাসের অংশ পায় না। কিন্তু উল্লিখিত ক্ষেত্রে স্ত্রীকে মীরাসের অংশ দিতে হবে। স্বামীর মৃত্যুকালে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ রক্ষার জন্য এ নীতি অবলম্বন করা হয়। (আবু যাহরা, *মালিক ইবনে আনাস*, পৃ. ৪০২ ; আমীন, মুহাম্মদ রুহুল, ২০১৩, ১৬১ থেকে উদ্ধৃত)

সাহাবা (রা.)ও মাসালিহে মুরসালা নীতি অনুসরণ করেছেন। রাষ্ট্রীয় নির্বাহী কাজের সুবিধার্থে বিভিন্ন বিভাগের প্রবর্তন, জেলখানা স্থাপন, ভূমির ওয়াক্ফ-এর প্রচলন ইত্যাদি সাহাবা (রা.) করেছিলেন মাসলাহাতের বিবেচনায়। ইত্যাদির নির্দেশনা কুরআন-সুন্নাহতে সরাসরি নেই। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাসলাহাত তথা জনসাধারণের কল্যাণার্থে শরী‘আত পরিপন্থী নয় এমন নীতির বিষয়ে সাহাবা (রা.)-দের মধ্যে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (ইমাম শাতিবী, *মিনহাজুল উসূল*, তা, বি. ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৮ ; রশীদ, আবদুর প্রমুখ, ২০১১, ১৪২-৪৩, থেকে উদ্ধৃত)

এ নীতি জনগণের কল্যাণার্থে এবং অকল্যাণ ও ক্ষতি প্রতিরোধ করতে প্রণয়ন করা হয়। অনিশ্চিত কল্যাণের সম্ভাবনা দৃষ্টে এ নীতি প্রয়োগ করা চলবে না। এ নীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে সামগ্রিক দিক থেকে দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণ বিবেচনায় নেওয়া অপরিহার্য। (রশীদ, আবদুর প্রমুখ, ২০১১, ১৪২) তবে কুরআন, সুন্নাহ এবং ইসলামি শরী‘আতের স্পৃহা পরিপন্থী কোনো বিষয়ে এ নীতি প্রয়োগ করা যাবে না।

২.৫. সাদ্দুয্ যারায়ে (سد الذرائع/Obstructing the means)

সাদ্দুয যারায়ে নীতির দ্বারা মন্দ, অনুচিত, অবৈধ, ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ কাজের উপায় রোধ করাকে বোঝায়। যেমন একটি কাজ মূলগতভাবে ভালো বা বৈধ। এখন এ কাজটি মন্দকাজের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা বৈধ বা নৈতিক হবে কিনা তা বিবেচনার নৈতিক মানদণ্ড হচ্ছে সাদ্দুয যারায়ে বা উপায়-উপকরণ রোধ করা (Obstructing the means)।

ইবনে কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ-এর মতে সাদ্দুয যারায়ে হচ্ছে এমন নীতি যা এমন বৈধ উপকরণ রুদ্ধ করে যা দ্বারা অকল্যাণ সাধিত হতে পারে আবার নাও হতে পারে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা অকল্যাণের দিকে ধাবিত করে এবং তার কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই অধিক প্রাধান্য পায়।”(ইবনে কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ, *আ‘লামূল মুআক্কিঈন*, খণ্ড, ৩, পৃ. ১০৮ ; আমীন, মুহাম্মদ রূহুল, ২০১৩, ১৭৮ থেকে উদ্ধৃত) কিছু আসবাব, উপায়-উপকরণ, পণ্য ইত্যাদি বৈধ এবং তার ক্রয়-বিক্রয়ও বৈধ। কিন্তু অবৈধ, মন্দ, অনুচিত, ক্ষতিকর কাজ বৃদ্ধিতে সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হলে তা বৈধ ও উচিত হবে কিনা, তা নৈতিক কিনা ইত্যাদি সাদ্দুয যারায়ের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়। যেমন–আঙ্গুর ফল, অস্ত্র-শস্ত্র এবং মানুষের জন্য উপকারী নানা পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ। কিন্তু এগুলো চরিত্রবিধ্বংসী,

সমাজের জন্য ক্ষতিকর ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কাজ বৃদ্ধি করতে পারে, এমন ক্ষেত্রে কি এগুলোর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ বা উচিত? এমতাবস্থায় নৈতিক ও ইসলামি শরী'আর দৃষ্টিতে এগুলোর ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ এবং অনুচিত। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ আবদুর রহীম বলেন, "বিদ্রোহী বা ডাকাত শ্রেণির লোকেরা যদি অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় করার প্রস্তাব পেশ করে, ফিকাহবিদদের মতে, তাদের কাছে অস্ত্র-শস্ত্র বিক্রি করা হারাম। কেননা তা কঠিন বিপর্যয় ঘটানোর মাধ্যম হতে পারে।" (রহীম, মুহাম্মাদ আবদুর, ২০০৬, ১৩৬) আঙ্গুর ফল ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। কিন্তু আঙ্গুর দিয়ে যারা মদ তৈরি করে তাদের কাছে আঙ্গুর বিক্রি করা নিষিদ্ধ। (আমীন, মুহাম্মদ রুহুল, ২০১৩, ১৭৯) কেননা মদপানকারীর মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটে, মদপান উন্মাদনা সৃষ্টি করে এবং মদপানকারী নেশাগ্রস্ত হয়ে নানা অপরাধ সংঘটিত করে। ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। অতএব সমাজ ও মানবতাকে ক্ষতি থেকে রক্ষার নিমিত্তে ক্ষেত্রবিশেষে বৈধ কাজও নিষিদ্ধ ও অবৈধ হয়। এ অবৈধতা নির্নয় করা হয় সাদ্দুয যারায়ে নীতি প্রয়োগ করে।

আরেকটি উদাহরণ বিশ্লেষণ করা যাক। আমাদের দেশে বিগত কয়েক বছর ধরে ইসরাইলি পণ্য বয়কটের আহবান লক্ষ করা যাচ্ছে। চরিত্রবিধ্বংসী পণ্য (যেমন মদ, গাঁজা, আফিম, হিরোইন ইত্যাদি) ব্যতীত অন্যান্য পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ। কিন্তু যা চরিত্রবিধ্বংসী নয় তা বয়কট কেন? এ বয়কট কি বৈধ বা নৈতিক হতে পারে? বস্তুত, ইসরাইল ফিলিস্তিনকে মৃত্যু-উপত্যকায় পরিণত করেছে। ফিলিস্তিনের লাখ লাখ মানুষকে বাস্তুহারা করেছে। হতাহত করেছে অসংখ্য শিশু ও মানুষকে। পীড়িত মানুষের নিকট ত্রাণসামগ্রী পৌঁছাতে বাধা সৃষ্টি করছে। ২০২৩-এর ৭ অক্টোবর থেকে ২০২৫-এর ২৫ মার্চ পর্যন্ত অর্ধ লক্ষাধিক মানুষকে হত্যা করেছে। এর মধ্যে প্রায় ১৬ হাজার শিশু। (*দৈনিক আমার দেশ*, ২৭ মার্চ, ২০২৫, পৃ. ৫) গাজাকে পরিণত করেছে মৃত্যুপুরীতে। এমতাবস্থায় সাদ্দুয যারায়ে নীতি অনুসারে ইসরাইলী পণ্য বর্জন করা বৈধ, ক্রয়-বিক্রয় না করা বৈধ। কেননা তাদের পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করলে প্রকারান্তরে তাদের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা হয়। তাদের পণ্য বর্জন করে তাদের শক্তিশালী হওয়ার একটি অন্যতম পথ রোধ করা হয়। এটি মানবতাকে ইসরাইলী ক্ষতি থেকে রক্ষা করার একটি উপায় হিসেবে বিবেচ্য।

২.৬. আল্ ইসতিসহাব (الاستصحاب / Legal presumption)

পূর্বাবস্থা স্থিত রাখার নীতিকে ইসতিসহাব বলে। পূর্ব প্রতিষ্ঠিত কর্তব্য বিষয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে যথার্থ কর্তব্য নির্ণয়ে এ নীতি প্রয়োগ করা হয়। এ নীতি অনুসারে, কোন বিধান, নীতি বা কার্যকে স্থায়ী বলে গণ্য করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তা রদ বা রহিত করার মত দলীল-প্রমাণ না পাওয়া যাবে। (রহীম, আবদুর, ২০০৬, ১৩৭) ইবনে কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহর মতে, "পূর্বে যা প্রতিষ্ঠিত ছিল তা বহাল রাখা এবং যা অনানুমোদিত ছিল তার প্রত্যাখ্যান স্থায়ীকরণই ইসতিসহাব।" (ইবনে কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ, *আ'লামুল মুআক্কিঈন*, খ. ১,পৃ. ৩৩৯, আমীন, মুহাম্মদ রুহুল, ২০১৩, ১৯২ থেকে উদ্ধৃত) যেমন

ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে করেছে বলে দাবি করছে পক্ষান্তরে ঋণদাতা ঋণশোধ করেনি বলে দাবি করছে। এমতাবস্থায় ঋণগ্রহীতা যদি ঋণপরিশোধের পক্ষে কোন প্রমাণ দেখাতে না পারে, তাহলে ঋণগ্রহীতার পূর্বাবস্থা অর্থাৎ সে ঋণগ্রস্ত প্রমাণিত হবে এবং তাকে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। আবার যদি কেউ ক্রয়, দান, উত্তরাধিকার, ওসিয়ত ইত্যাদি সূত্রে কোনো সম্পদের মালিক হয়, পরবর্তীতে আরেকজন ঐ সম্পত্তির মালিকানা দাবি করে। এমতাবস্থায় পরবর্তী জন যদি তার মালিকানার পক্ষে কোন দলীল-প্রমাণ উপস্থিত করতে না পারে তাহলে পূর্বাবস্থা অর্থাৎ পূর্বে যার মালিকানায় এ সম্পত্তি ছিল, তার মালিকানাই প্রতিষ্ঠিত হবে। অনুরূপভাবে X যদি দাবি করে সে Y কে বিবাহ করেছে, কিন্তু

Y তা অস্বীকার করে। এক্ষেত্রে X প্রমাণ উপস্থাপন না করা পর্যন্ত X এর দাবি প্রত্যাখ্যাত হবে। অর্থাৎ 'Y'- X-এর স্ত্রী না হওয়াই সাব্যস্ত হবে। (আমীন, মুহাম্মদ রুহুল, ২০১৩, ১৯২-৯৩) এভাবে ইসতিসহাব নীতির মাধ্যমে নৈতিক কর্তব্য নির্ণয় করা যায়।

২.৭. সাহাবী (রা.) ও তাবে'ঈদের আমল ও অভিমত (Practices and opinions of companions of the Prophet sm. and practices and opinions of tabe'in)

নৈতিক কর্তব্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইসলামে স্বীকৃত ব্যক্তিবর্গের 'আমল, উক্তি, অভিমত, সিদ্ধান্ত, কার্যাবলি ইত্যাদি নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত হয়। ইসলামে স্বীকৃত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সাহাবা (রা.) এবং তাবে'ঈগণ অন্যতম।

কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস এবং অন্যান্য গ্রহণযোগ্য নীতিতে নৈতিক কর্তব্যের নির্দেশনা পাওয়া না গেলে বিবেচ্য বিষয়ে সাহাবী (রা.) অথবা তাবে'ঈদের 'আমল, উক্তি, সিদ্ধান্ত ইত্যাদির মাধ্যমে নৈতিক কর্তব্য নির্ণয় করা বাঞ্ছনীয়। কেননা নবী (স.)-এর পর সাহাবা ও তাবেঈদের মর্যাদা।

আল কুরআন এবং হাদিসে সাহাবাদের প্রশংসা এবং তাঁদেরকে অনুসরণের নির্দেশনা রয়েছে। যেমন আল কুরআনে আল্লাহ বলেন, "মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী আর যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে তাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।" (আল কুরআন, ৯:১০০) নবী (স.) বলেন, "আমার সুন্নত ও সত্য পথধারী হিদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত অনুসরণ করা তোমাদের কর্তব্য। এ সুন্নতকে তোমরা আঁকড়ে ধরো, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরার মতো।" (আবু দাউদ, *সুনান*, হাদিস নম্বর, ৪৬০৭)

সাহাবা (রা.)-দের পরে তাবেঈ (র.)-দের মর্যাদা। নবী বলেন, "আমার যুগ (আমার প্রজন্ম) সর্বোত্তম। অতঃপর পরবর্তীদের (অর্থাৎ সাহাবীদর) যুগ (প্রজন্ম) শ্রেষ্ঠ, অতঃপর যারা আসবে তাদের (তাবেঈদের যুগ) শ্রেষ্ঠ।" (বুখারী, হাদিস নম্বর, ৩৬৫১)। তাবেঈগণ সাহাবা (রা.)-দের সাহচর্যে নিজেদেরকে ইসলামি আদর্শে গড়ে তোলার সুযোগ পেয়েছেন – এ কারণে তাঁদের কর্মপন্থা, সিদ্ধান্ত, অভিমত ইসলামি নৈতিকতা ও বিধি-বিধান উদ্ভাবনে তাৎপর্য বহন করে।

২.৮. 'উরফ (العرف / Good customs)

সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি, রেওয়াজ ও প্রথাকে 'উরফ বলে। ইসলামবেত্তাদের মতে, "সমস্ত লৌকিক ও প্রচলিত ভাল কথা ও কাজ 'উরফ-এর অন্তর্ভুক্ত।" (রশীদ, আবদুর প্রমুখ, ২০১১, ১৩৭) যে সকল প্রথা জনগণ, সমাজ ও মানবতার জন্য কল্যাণকর নয়, বরং ক্ষতিকর তা 'উরফ হিসেবে বিবেচিত নয়। বিভিন্ন রসম-রেওয়াজ বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত আছে। এদের মধ্যে যা কুসংস্কারযুক্ত, অনর্থক, যুক্তিহীন এবং কল্যাণপ্রসূ নয় – তা 'উরফ-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। রীতি-নীতি ও প্রথার মধ্যে যা সমাজে ও জনগোষ্ঠীর জন্য কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক তা-ই 'উরফ হিসেবে বিবেচিত। তবে 'উরফ কুরআন, সুন্নাহ এবং শরী'আতের পরিপন্থী হলে তা ইসলামিবিধান হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। 'উরফ বা সৎ রেওয়াজ-প্রথা ইসলামি নৈতিকতা বা বিধানের মানদণ্ড হওয়ার জন্য তা বিপুল জনগণ বা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর দ্বারা অনুশীলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই সাথে এ জগগোষ্ঠীর নিকট উক্ত রেওয়াজ বা প্রথা সমাজের কল্যাণের জন্য অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত হতে হবে। ঐ প্রথা দেশের আইনের সাথেও সাংঘর্ষিক হতে পারবে না। (আমীনী, মুহাম্মদ তাকী, ২০০৪, ১৮৯-৯০) এ কারণে

ফকীহদের কেউ কেউ ‘উরফকে ইজমার সমপর্যায়ভুক্ত মনে করেন। (Hedaya, vol.vi, pp. 177-178, Quoted in, Rahim, Abdur, 2006, 131)

দেশ-কাল ও সমাজভেদে রীতি-নীতি ও ‘উরফ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। এক অঞ্চলের ‘উরফ অন্য অঞ্চলের নিয়ম-নীতি ও আইনের উপর প্রভাব বিস্তার করে না। ‘উরফ ততদিনই নীতি হতে পারে যতদিন তা সমাজে বিদ্যমান থাকে। আবার এক কালের ‘উরফ অন্য কালের জন্য প্রাসঙ্গিক হয় না। (*Raddul Muhtar*, vol.iii, pp 408-409 ; Quoted in, Rahim, Abdur, 2006,132)

আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগে দিয়াত[৮] (রক্তপণ) ছিল ১০০ উট। সাহাবা (রা.) এবং তাবেঈনদের যুগেও এ রীতি প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালের ফকীহগণও এ প্রথাকে বহাল রেখেছেন। (আমীনী, মুহাম্মদ তাকী, ২০০৬, ১৮৬) আমাদের সমাজেও ‘উরফের ভিত্তিতে অনেক কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। যেমন ইসতিসনা চুক্তি। ইসতিসনা এমন চুক্তি যাতে ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক বিক্রেতা পণ্য সরবরাহ করতে অঙ্গীকার করে থাকে। আবার বিভিন্ন ইলেক্ট্রিক সামগ্রী নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বিনামূল্যে মেরামত বা সার্ভিস, বিকল হলে পরিবর্তন করে দেওয়া ইত্যাদি শর্তে ক্রয়-বিক্রয় – ‘উরফের ভিত্তিতে বৈধ হয়ে থাকে। বিবাহে কুফু তথা পাত্র-পাত্রীর সমকক্ষতা বিবেচনা করা দাম্পত্যজীবনের কল্যাণের জন্য করা হয় ‘উরফের ভিত্তিতে। আরবে এ প্রথার প্রচলন ছিল। ইসলাম এ প্রথাকে গ্রহণ করেছে। (আমিন, মুহাম্মদ রুহুল, ২০১৩, ১৭৫)

২.৯. প্রচলিত আইন (Customary laws)

ইসলামি নৈতিকতার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে “আমরু বিল মা‘রুফ ওয়া নাহী ‘আনিল মুনকার” – ন্যায়, কল্যাণ ও মঙ্গলজনক কাজের আদেশ করা এবং অন্যায় ও গর্হিত কাজ প্রতিহত করা। এ নীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল দেশীয় প্রচলিত আইন নৈতিক কর্তব্য নির্ণয়ে কার্যকর বিধি হতে পারে। তবে ইসলামি শরী‘আ পরিপন্থী হলে সে আইন নৈতিক বিধি বলে গণ্য হবে না।

নবী (স.) এবং তাঁর পরবর্তী যুগে ইসলাম প্রসারিত হয়েছে। রোম ও পারস্যসহ বহু দেশ ও অঞ্চলে মুসলিমদের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়েছে। এর ফলে মুসলিমেরা বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর ভাষা-সংস্কৃতি, লোকাচার, রীতি-নীতি, প্রথা ও আইনের সংস্পর্শে এসেছে। যে সকল কৃষ্টি, প্রথা ও আইন জনগণ ও মানবতার জন্য ক্ষতিকর তা মুসলিমেরা গ্রহণ করেনি। আর যে সব রীতি-নীতি ও আইন ইসলামি শরী‘আতের বিরোধী নয় ; বরং জনগণ ও মানবতার জন্য কল্যাণকর তা বহাল রেখেছেন।

মহানবী (স.) আরবে প্রচলিত মানবতার জন্য ক্ষতিকর আইন বাতিল করেছেন, কিছু আইন সংশোধন করেছেন, কিছু আইন বহাল রেখেছেন। “মামলা-মোকাদ্দমা, সালিশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রমাণ পেশ করা বাদীর দায়িত্ব আর অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি অভিযোগ অস্বীকার করে তাহলে কসম বা শপথ করা বিবাদীর জন্য ওয়াজিব।” এ বিধিটি মহানবী (স.) আরবের প্রচলিত আইন থেকে গ্রহণ করেছিলেন। বিয়ে-শাদীর ক্ষেত্রে ইজাব-কবুল, মোহর ইত্যাদিও মহানবী (স.) আরবের প্রচলিত আইন থেকে গ্রহণ করেছিলেন। সম্পত্তি ব্যবহার ও হস্তান্তরের কয়েকটি পদ্ধতি যেমন–ক্রয়-বিক্রয়, হিবা, বন্ধক, ইজারা ইত্যাদির ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি যাতে কলহ-বিবাদ সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল তা তিনি বাদ দিয়েছিলেন অথবা শর্তারোপ করেছিলেন। (আমীনী, মুহাম্মদ তাকী, ২০০৪, ১৯১-৯২) আরবদের মধ্যে নির্যাতন-নিপীড়ন-অত্যাচার ইত্যাদির জন্য নির্ধারিত শাস্তির বিধান ছিল। কিসাস (হত্যার বদলে হত্যা), দিয়াত (হতাহতের জন্য রক্তমূল্য) ইত্যাদি প্রচলিত ছিল। ব্যভিচার ও চুরির জন্য সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান ছিল। মহানবী (স.) আরবে প্রচলিত এসব প্রথার মধ্যে ন্যায় ও মঙ্গলজনক বিধান ও আইন বহাল রেখে

অথবা শর্তারোপ করে সেখানে একটি সুসংবদ্ধ রাষ্ট্র ও খেলাফতব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। (শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ, খণ্ড, ২, ২০১২, ১০১-১০৯)

নবী পরবর্তীকালে সাহাবা (রা.), তাবে'ঈগণ দেশীয় আইন, সমাজনীতি ও লোকাচারের যা কল্যাণকর তা গ্রহণ করেছেন আর যা অনৈতিক, ক্ষতিকর এবং অমঙ্গলজনক তা বর্জন করেছেন। পরবর্তীকালের ফকীহগণও নৈতিকতার এ নীতি তাঁদের ফিকাহ ও আইনশাস্ত্রে চালু রেখেছেন।

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, ইসলামি নৈতিকতায় মুখ্য (আল কুরআন ও সুন্নাহ) ও গৌণ মানদণ্ড (ইজমা, কিয়াস, ইসতিহসান, মাসালিহে মুরসালা, সাদ্দুয যারায়ে, আল ইসতিসহাব, সাহাবা ও তাবে'ঈদের আমল ও অভিমত, 'উরফ, প্রচলিত আইন ইত্যাদি)-এর মাধ্যমে ইসলামি শরী'আতের মূল উদ্দেশ্য "জালবুল মানফা'আতে ওয়া দাফ'উল মাদাররাতে" – অর্থাৎ কল্যাণ অর্জন ও ক্ষতির প্রতিরোধ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।

পাশ্চাত্যের নীতিদার্শনিকেরা নৈতিকতার বিভিন্ন মানদণ্ড প্রবর্তন করেছেন। এসবের মধ্যে সুখবাদ[৯] (Hedonism), বুদ্ধিবাদ[১০] (Rationalism), স্বজ্ঞাবাদ[১১] (Intutionism), পূর্ণতাবাদ[১২] (Perfectionism) উল্লেখযোগ্য। এসবের প্রত্যেকটি একেকটি স্বতন্ত্র মানদণ্ড। এসব মতবাদের প্রবক্তারা নিজেদের মানদণ্ডটিকে পূর্ণ বলে মনে করেন। কিন্তু অন্য দার্শনিকের মানদণ্ডটির উদ্ভব বা বিদ্যমানতা তার মানদণ্ডটির অপূর্ণতা বা সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করে। এ কারণে এ মানদণ্ডগুলোর কোনটিকে কালোত্তীর্ণ বলা যায় না। পক্ষান্তরে নৈতিকতার ইসলামি মানদণ্ড যেহেতু একাধিক সে কারণে স্থান-কাল, সমাজভেদে এ মানদণ্ড প্রয়োগ করা যায়। অনাগত ভবিষ্যতে মানবজাতি যে সকল নৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হবে তাও ইসলামি মানদণ্ডের আলোকে বিবেচনা করা যাবে। নৈতিকতার ইসলামি মানদণ্ডের সার্থকতা এখানে যে, মুখ্য মানদণ্ডে সরাসরি সমাধান পাওয়া না গেলে দ্বৈতীয়িক মানদণ্ড দিয়ে নৈতিক সমস্যার সমাধান করা যায়।

নৈতিকতার বিষয়গুলোকে ইসলামি আইন বিশেষজ্ঞগণ ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাহ, মুস্তাহাব ইত্যাদি নামে শ্রেণিকরণ করেছেন। আবার অনৈতিক কাজগুলোকে হারাম, মাকরুহ ইত্যাদি নামে শ্রেণিকরণ করেছেন। ধনবানের অর্থে গরীবদের অধিকার রয়েছে। (আল কুরআন, ৫১ ; ১৯) যাকাত প্রদানের মাধ্যমে গরীবদের অধিকার আদায় করা হয়। যাকাত প্রদান করা ফরয। আদায় না করলে ফরয পরিত্যাগের গুনাহ হয়। মিথ্যা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কবীরা গুনাহ অর্থাৎ জঘন্য অপরাধ (হারাম)। জঘন্য অনৈতিক কাজ। ফরয, ওয়াজিব অবশ্যই পালন করতে হয়। আর হারাম, মাকরূহ অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হয়। ফরয-ওয়াজিব পালনের মধ্যে এবং হারাম-মাকরূহ পরিত্যাগের মধ্যে মানবের ইহ-পরকালীন কল্যাণ নিহিত রয়েছে। ইসলাম এভাবে নৈতিক কাজকে পুণ্য আর অনৈতিক কাজকে পাপ হিসেবে গণ্য করে মানবতাকে চিরকল্যাণ ও মঙ্গলের পথ নির্দেশ করে।

টীকা (Notes)

১। **আমলে সলেহ :** আমলে সলেহ বলতে ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিক সৎকর্মকে বোঝায়। নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি কর্ম যা হক্কুল্লাহ তথা আল্লাহর প্রতি কর্তব্য তা আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় সৎকর্ম হিসেবে পরিগণিত। আবার কোন কোন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কর্ম একই সাথে আল্লাহ ও

বান্দার প্রতি কর্তব্য হতে পারে। আর সমাজ, মানুষ ও সৃষ্টজীবের প্রতি যে কর্তব্য তা নৈতিক ও মানবিক সৎকর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়।

২। **আল কুরআনের বিষয়বস্তু :** আল কুরআনের পাঁচ ধরনের বিষয়বস্তু হচ্ছে নিম্নরূপ :

ক) ইলমুল আহকাম: আদেশ-নিষেধ, অনুমোদন-অনানুমোদন, ইত্যাদি বিষয়।

খ) ইলমুল মুখাসামা : ইহুদি, খ্রিস্টান, মুশরিক ও মুনাফিক প্রভৃতি পথভ্রষ্ট দলসমূহের বাদানুবাদ সম্পর্কিত বিষয়।

গ) ইলমুত তাযকীর বি আলা ইল্লাহ : আল্লাহর নিদর্শন এবং মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পর্কিত বিষয়।

ঘ) ইলমুত তাযকীর বি আইয়্যামিল্লাহ : পুণ্যবানদের পুরস্কার এবং পাপিষ্ঠদের শাস্তি সম্পর্কিত বিষয় এবং

ঙ) ইলমুল তাযকীর বিল মউত : মৃত্যুপরবর্তী জীবন সম্পর্কিত বিষয়।

৩। **কবিরা গুনাহ :** কবিরা গুনাহ জঘন্য অপরাধ। যে গুনাহের জন্য শাস্তি অবধারিত। তবে তওবার ফলে কবিরা গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন। শরী'আতে পার্থিব জীবনে কবিরা গুনাহের শাস্তি হদ্দের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। যেমন – নিরপরাধ মানুষকে হত্যা, যেনা বা ব্যভিচার করা, চুরি করা। এ ধরনের গুনাহের জন্য পরকালে জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। এ গুনাহের জন্য আল কুরআন ও হাদিসে আল্লাহর গদব (ক্রোধ), এবং লা'নত (অভিসম্পাত) ঘোষণা করা হয়েছে। সুদ খাওয়া, মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া, মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া ইত্যাদি কবিরা গুনাহ।

৪। **সগিরা গুনাহ :** নগণ্য অপরাধ। এ গুনাহের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট কোন শাস্তি বা আল্লাহর গদব (ক্রোধ) বা লা'নত (অভিসম্পাত)-এর ঘোষণা করা হয়নি। কাউকে গালি দেওয়া, হিংসা করা, নারীদের দিকে লোলুপ দৃষ্টি দেওয়া, রাস্তাঘাটে কষ্টদায়ক বস্তু ফেলা যাতে পথিক কষ্ট পায়, এমন কিছু পান করা যা দুর্গন্ধের কারণ হয় এবং যে দুর্গন্ধে আশেপাশের লোক কষ্ট পায় ইত্যাদি সগিরা গুনাহ। তওবা না করলেও পুণ্য কাজের বদৌলতে এ গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

৫। **ইদ্দত :** বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা নারীর পালনীয় নির্দিষ্ট সময়সীমাকে ইদ্দত বলে। বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা নারী একটি নির্দিষ্ট সময়-সীমা অতিক্রম না করা পর্যন্ত পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। এ নির্দিষ্ট সময়সীমাকে ইদ্দত বলে। ইদ্দদ পালনে সময়সীমায় ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্নতা আছে। তবে সাধারণ সময়সীমা হচ্ছে "৪ মাস ১০ দিন"। (আল কুরআন, ২:২৩৪)

৬। **হদ্দ :** সীমা, আওতা। ইসলামি শরী'আতে অনুমোদিত কাজের সীমা অথবা নিষিদ্ধ কাজের সীমা বোঝাতে একবচনে হদ্দ আর বহুবচনে হুদূদ ব্যবহৃত হয়। ইসলামি আইন বিজ্ঞানে হদ্দ হচ্ছে নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট দণ্ড। যেমন–নিরপরাধ মানুষকে হত্যার হদ্দ (নির্ধারিত শাস্তি) হচ্ছে হত্যা। ব্যভিচারী বিবাহিত পুরুষ বা নারীর শাস্তির হদ্দ হচ্ছে হত্যা। চুরির হদ্দ হচ্ছে হাত কর্তন করা। এভাবে নির্দিষ্ট অপরাধের কুরআন-সুন্নাহয় নির্ধারিত শাস্তি হচ্ছে হদ্দ।

৭। **'ইল্লাত :** 'ইল্লাত শব্দের অর্থ হচ্ছে কারণ, যুক্তি বা ভিত্তি। 'ইল্লাত হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি ভিত্তি। আসল (اصل)- এ যে ভিত্তিটি রয়েছে সে ভিত্তিটি যদি ফর'আ তথা শাখার মধ্যে থাকে তাহলে

আসলের জন্য যে বিধান বা শাখা বা সদৃশ বস্তুর ক্ষেত্রেও একই বিধান কার্যকর হবে। এভাবে দুই সদৃশ বস্তুর মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ বা ভিত্তি বা সাদৃশ্যের সমতা হিসেবে যে গুণটি ভূমিকা রাখে সে গুণটিই হচ্ছে 'ইল্লাত।

৮। **দিয়াত :** কাউকে হত্যা বা আহত করার কারণে যে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় তাকে দিয়াত বলে। কাউকে বিনা অপরাধে হত্যা করা হলে, নির্ধারিত শাস্তি হচ্ছে হত্যাকারীকে হত্যা করা। কিন্তু নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ আর্থিক ক্ষতিপূরণ আদায়ের মাধ্যমে হত্যাকরীকে ক্ষমা করে দিতে পারে। এ আর্থিক ক্ষতিপূরণকে দিয়াত (রক্তমূল্য) বলে। অঙ্গহানির কারণেও দিয়াত প্রযোজ্য হয়।

৯। **সুখবাদ :** সুখবাদ সুখকে নৈতিকতার মানদণ্ড মনে করে। অর্থাৎ যে ঐচ্ছিক কর্ম সুখ উৎপাদন করে তা ভাল আর যে কর্ম সুখ উৎপাদন করতে ব্যর্থ হয়, তা মন্দ। সুখ নানা ধরনের হতে পারে। স্থুল বা সূক্ষ্ম সুখ। মনস্তাত্ত্বিক সুখ বা নৈতিক সুখ। সুখবাদের একটি ধরন হচ্ছে উপযোগবাদ। উপযোগবাদ অনুসারে কোন কাজ সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক পরিমাণ সুখ উৎপাদন করলে তা ভাল বা উচিত বলে বিবেচিত হবে। অন্যথায় তা মন্দ বা অনুচিত। এ মতবাদ অভিজ্ঞতামূলক।

১০। **বুদ্ধিবাদ :** মানুষ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন প্রাণী। তার বুদ্ধি তাকে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক করে। মানুষ তার বুদ্ধি দিয়ে ভাল-মন্দ নির্ণয় করতে পারে। মানুষের ব্যবহারিক বিচার-বুদ্ধি রয়েছে। তার ব্যবহারিক বিচার-বুদ্ধিই তার বিবেক। মানুষের ব্যবহারিক বুদ্ধি তথা বিবেকই নৈতিকতার মানদণ্ড। বিবেকের নির্দেশেই মানুষ ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত, করণীয়-বর্জনীয় নির্ণয় করতে পারে। তার এই বিবেকের নির্দেশ অভিজ্ঞতাপ্রসূত নয়; বরং বুদ্ধিপ্রসূত।

১১। স্বজ্ঞাবাদ : সরল কথায় – যে মতবাদ মনে করে স্বজ্ঞা (Intuition) দিয়ে কাজের ভালত্ব-মন্দত্ব নির্ণয় করা যায়। স্বজ্ঞা হচ্ছে এমন একটি কিছু যা দিয়ে কোন কিছুর মধ্যস্থতা ছাড়া সরাসরি বস্তুর জ্ঞান লাভ করা যায়। স্বজ্ঞা একটি মানবীয় বৃত্তি। এ বৃত্তি দ্বারা বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতার মধ্যস্থতা ছাড়াই কোন বিশেষ কাজ, বিশেষ শ্রেণির কাজ অথবা কোন নিয়ম-নীতি ভাল না মন্দ, উচিত না অনুচিত তা সরাসরি উপলব্ধি করা যায়।

১২। **পূর্ণতাবাদ :** পূর্ণতাবাদ অনুসারে পূর্ণতা হচ্ছে নৈতিকতার মানদণ্ড। আর পূর্ণতা অর্জিত হয় আত্মোপলব্ধি (Self-realisation)-এর মাধ্যমে। নিজেকে বিকাশের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে উপলব্ধি করে। সে আত্মসম্ভোগ পরিহার করে আত্মত্যাগের নীতিতে যখন বলিয়ান হয়, তখন সে নিজেকে উপলব্ধি করতে থাকে। নিজে মহৎ হতে থাকে। নিজেকে উপলব্ধি ও মহৎ হওয়ার প্রচেষ্টায় যা তার জন্য সহায়ক তা ভাল-উচিত আর যা তার আত্মোপলব্ধি তথা পূর্ণতা অর্জনের পরিপন্থী তা মন্দ ও অনুচিত। পূর্ণতাবাদের দুটি মূল উপজীব্য হচ্ছে : ক) মানুষ হও (Be a person) এবং খ) বাঁচার জন্য মর (Die to live) ।

উল্লেখপঞ্জি

পবিত্র ঐশী গ্রন্থ

কোরআন মাজীদ, অনু., আহমদ, হাফেজ মুনির উদ্দীন, (২০১৬)। ঢাকা : আল কোরআন একাডেমী পাবলিকেশন্স।

হাদিস সংকলন

আন্‌নববী, ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া, (২০১৫)। *রিয়াদুস সালেহীন*, অনু., আলী, সাইয়েদ মুহাম্মদ প্রমুখ, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।

Abu Dawud As-Sijistani, (2008), *Sunan Abu Dawud*, trans. As-Sharif, Muhammad Mahdi, Lebanon : Dar al Kutub al-ilmiyah.

Imam Bukhari, Abu Abdulllah Muhammad Ibn al Isma‘il, (1997), *Sahih al Bukhari*, trans. Khan, Muhammad Muhsin, Saudi Arabia : Riyadh ; Darussalam.

ইমাম বুখারী, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, (২০০১), *আল আদাবুল মুফরাদ*, অনু., মুসা, মুহাম্মদ, ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন।

অন্যান্য গ্রন্থ

আবদুল্লাহ, আবু ছাইদ মোহাম্মদ, (১৯৯৭)। *ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

আমিন, মুহাম্মদ রুহুল, (২০১৩)। *ইসলামী আইনের উৎস*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল’ রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল সেন্টার, ঢাকা।

আমীনী, মুহাম্মদ তাকী, (২০০৪)। *ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস*, অনু. তালিব, আবদুল মান্নান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

আস্‌সুবায়ী, মুসতাফা হুস্‌নী, (২০০৪)। *ইসলামী শরীয়াহ্‌ ও সুন্নাহ্‌*, অনু. ইসলাম, এ. এম. এম. সিরাজুল, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

এমরান, সৈয়দ শাহ, (২০১৯)। *ইসলামী পরিভাষা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

দেহলভী, শাহ্‌ ওয়ালি উল্লাহ্‌, (২০০৪)। *আল ফাউযুল কবীর*, অনু. ফারুক, আখতার, কুতুবখানায়ে রশীদিয়া, ঢাকা।

.... , (২০০১)। *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ*, ২য় খণ্ড, অনু. ফারুক, আখতার, কুতুবখানায়ে রশীদিয়া, ঢাকা।

রশীদ, আবদুর প্রমুখ, (২০১১)। *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, ১ম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

রহীম, মুহাম্মাদ আবদুর, (২০০৬)। *ইসলামী শরীয়াতের উৎস*, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা।

সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, (২০০৯)। *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, ১ম ও ২য় খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

Doi, ‘Abdur Rahman I., (1997), *Shari‘ah : The Islamic Law*, Ta ha Publishers, London.

Rahim, Abdur, (2006), *The Principles of Islamic Jurisprudence,* Kitab Bhavan, New Delhi, India.